শারদীয় বড় উৎসব দূর্গাপুজা

বাংলাদেশে শুরু হয়েছে হিন্দু সম্প্রদায়ের সর্ববৃহৎ ধর্মীয় উৎসব সার্বজনীন দূর্গাপুজা। সারা দেশের মত মেহেরপুরে শুরু হয়েছে দূর্গাপূজো। এই করোনাকালীন সময়েও উৎসবের কোন ঘাটতি নেই। যতটা স¤ভব স্বাস্থ্যবিধি মেনেই চলছে অনুষ্ঠানাদি। আজ নবমী। এখানে দূর্গাপুজা নিয়ে দুটি কথা বলার চেষ্টা করেছি।

পুরাণের মতে ব্রহ্মার বরদান পেয়ে অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছিল অসুররাজ মহিষাসুর। যুদ্ধে অসুর বাহিনীর কাছে পরাস্ত হয়ে সিংহাসন হারিয়েছিলেন দেবতা ইন্দ্র। স্বর্গে দেবতাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। সমস্যার সমাধানের জন্য ভগবান বিষ্ণুর দ্বারস্থ হন দেবতারা। কিন্তু মহিষাসুরকে রুদ্ধ করার কোনো কৌশল খুঁজে পাচ্ছিলেন না কেউই। কারণ ব্রহ্মার বরদান অনুযায়ী কোনও পুরুষ বা কোনও দেবতা মহিষাসুরকে বধ করতে পারবে না। সেই কারণেই অসুর নিধনে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের ত্বেজ থেকে জন্ম হয় ময়ামাহার। হিন্দুশাস্ত্র মতে, কাত্যায়ণ ঋষির আশ্রমে দূর্গার জন্ম হয়েছিল বলে তাঁর আর এক নাম কাত্যায়ণী। আশ্রমেই শুক্লসপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী এই তিনদিন আরাধনার মাধ্যমে দেবীর আবাহন করেন ঋষি কাত্যায়ণ। চতুর্থ দিন অর্থাৎ দশমীতে মহিষাসুরবধ করেন দেবী।

শরৎকালে আশ্বিন মাসে চিরাচরিত দূর্গাপুজো হয়ে থাকে তাই এই উৎসবের আর এক নাম শারদীয়া। কিন্তু রাবণের সঙ্গে যুদ্ধে যাওয়ার আগে দেবী দূর্গাকে তুষ্ট করতে বসস্তকালেই দেবীর আবাহণ করেন অযোধ্যার রাজা রামচন্দ্র। অন্যসময়ে বা অকালে দেবীর বোধন হয় বলে এই পূজা অকাল বোধন নামেই পরিচিত। ১০৮টি নীলপদ্ম দিয়ে পুজো করলে দেবী প্রসন্ন হবেন একথা জানতেন রাম। আর তাই নীলপদ্মের সন্ধানে সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়ান তিনি। কিন্তু ১০৭টি পদ্ম খুঁজে পান তিনি। বাকি একটি পদ্মের ঘাটতি মেটাতে নিজের একটি চোখ দেবীর কাছে সমর্পণ করার সিদ্ধাস্ত নেন রাম। এহেন শ্রদ্ধায় সন্তুষ্ট হয়ে দেবী রামের সম্মুখে প্রকট হয়ে আশীর্বাদ দেন। যুদ্ধ শুরু হয় সপ্তমীতে। ভয়াবহ যুদ্ধ চলতে থাকে। অবশেষে অষ্টমী ও নবমীর সন্ধিক্ষণে রামের হাতে মৃত্যু হয় রাবণের। দশমীর দিন রাবণের শবদাহ করা হয়।

বাংলায় কবে ও কারা প্রথম দূর্গাপুজোর প্রচলন করেন তা নিয়ে অনেক মতভেদ রয়েছে। ইতিহাসের পাতা ঘেঁটে জানা যায় ১৫০০ সালে বাংলায় প্রথম দূর্গাপুজো হয়। দিনাজপুর ও মালদহের জমিদাররা প্রথম

দূর্গাপুজোর শুরুর পরিকল্পনা নেন। কারও মতে, তাহেরপুরের রাজা কংসনারায়ণ প্রথম সাড়ম্বরে দূর্গাপুজো শুরু করেন। কারও দাবি নদিয়ার ভাষানন্দ মজুমদার প্রথম শারদীয়া পুজোর সূচনা করেন। মানুষ তার সৃষ্টির জন্য তার বিশ্বাস অনুসারে সাধারণত একজন প্রতিপালকের আনুগত্য মেনে নেয়। আর এ আনুগত্য প্রকাশে কিছু শাস্ত্রীয় মাঙ্গলিক ক্রিয়া কর্মাদিরও প্রচলন আছে। প্রত্যেক ধর্মেরই কিছু ধর্মীয় রীতি ও সংস্কার আছে। যে রীতি ও সংস্কারের মূলে রয়েছে একটি ঐকাস্তিক বিশ্বাস। আর সকল বিশ্বাসের মূলেই বিজ্ঞান নিস্ক্রিয়। কিছু রীতির সমালোচনা থাকলেও অধিকাংশ রীতির ও সংস্কারের উদ্দেশই হলো বিশ্ব ভ্রমান্ডের সকল মানুষ ও প্রাণীর মঙ্গল কামনা। আর সার্বজনীন মঙ্গল কামনায় কোন সংস্কারে হিংসার স্থান নেই। বরং আছে মানবতার বিকাশ, নীতি নৈতিকতা আর ভ্রাতৃত্ববোধের পরম শিক্ষা।

ধর্মীয় আচার ও সংস্কৃতির এ ধারাবাহিকতায় সনাতন ধর্মাবলম্বীরা প্রতি বছরই দেবী দূর্গার পূজা পালন করে আসছে। শারদীয় দুর্গোৎসব রূপ নিয়েছে সনাতন হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের প্রাণের উৎসবে। তবে এই প্রাণের উৎসবে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাই অংশগ্রহণ করে বলে এটা শুধুমাত্র ধর্মীয় উৎসবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। হয়ে উঠেছে সর্বজনীন উৎসবে। যেহেতু বাঙালি উৎসব প্রিয় জাতি, সেহেতু এই দেশের অধিকাংশ অসাম্প্রদায়িক মানুষের সহাবস্থানের কারণেই অনেক বছর ধরেই এই উৎসবে মিলন ঘটে অসংখ্য আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার। এই জন্যই বলা হয়ে থাকে ধর্ম যার যার, উৎসব সবার। সাধারণত মাটির মুর্তিতে দেবীর আবাহন হলেও পূজা হয় হৃদ মন্দিরে। দেহ-বীণার তন্ত্রীতে বাজবে মঙ্গল ঘন্টা। মঙ্গল দীপের আলোতে আলোকিত হবে মন-প্রাণ। ভজন, পূজন আর আরাধনার আয়োজনে ব্যস্ত হবে ভক্ত প্রাণ। মায়ের পূজা অর্চণা আর ঢাকের শব্দে মুখরিত হবে চারপাশ। মাঙ্গলিক মন্ত্র উচ্চারণের মধ্য দিয়ে কামনা করা হবে বিশ্ব শাস্তির অমিয় বাণী।

শারদীয় দূর্গাপূজা শুরু হয়েছে ২২ অক্টোবর। দোলায় চড়ে দূর্গা দেবী এসেছেন ফিরে যাবেন গজে। সঙ্গে নিয়েছেন গণেশ, কার্তিক, লক্ষী আর সরস্বতীকে। আসছেন তারা ভক্তদের শুভবুদ্ধির পথ দেখাতে। অসুর শক্তির বিরুদ্ধে সুর শক্তির চেতনা জাগাতে। করোনা নামের অসুরকে শেষ করতে দেবী দূর্গা এসেছেন মর্ত্যে। সনাতন ধর্মাবলম্বী বাঙালিদের সবচেয়ে বড় উৎসব দূর্গাপূজা। দূর্গাপূজা বা দুর্গোৎসব হল হিন্দু দেবী দূর্গার পূজাকে কেন্দ্র করে প্রচলিত একটি উৎসব। দূর্গাপূজা সমগ্র হিন্দুসমাজেই প্রচলিত। তবে বাঙালি হিন্দু সমাজে এটি প্রধান ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসব। আশ্বিন বা চৈত্র মাসের

শুক্লপক্ষে দূর্গাপূজা করা হয়। আশ্বিন মাসের দূর্গাপূজা শারদীয় দূর্গাপূজা এবং চৈত্র মাসের দূর্গাপূজা বাসস্তী দূর্গাপূজা নামে পরিচিত। শারদীয় দূর্গাপূজার জনপ্রিয়তা বেশি।

দূর্গাপূজা ভারত, বাংলাদেশ ও নেপাল সহ ভারতীয় উপমহাদেশ ও বিশ্বের একাধিক রাষ্ট্রে পালিত হয়ে থাকে। তবে বাঙালি হিন্দু সমাজের প্রধান ধর্মীয় উৎসব হওয়ার দরুন ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরা রাজ্যে দূর্গাপূজা বিশেষ জাঁকজমকের সঙ্গে পালিত হয়। বাংলাদেশে হিন্দু সমাজেও দূর্গাপূজা বিশেষ উৎসাহের সঙ্গে পালিত হয়।

পেঁয়াজ সমাচার এবং আমাদের চরিত্র

সম্প্রতি একরকম হঠাৎ করেই বাংলাদেশে পেঁয়াজ রফতানী বন্ধ করে দিয়েছে ভারত। অবশ্য কিছুদিন আগেও একবার এরকম করেছিলো তারা। এর ফলে তখনও যে ঘটনা ঘটেছিলো এখনও ঠিক সেই ঘটনাই ঘটলো। রফতানী বন্ধ ঘোষনা দেবার পরদিনই বাংলাদেশে পেঁয়াজের দাম দ্বিগুনেরও বেশি হয়ে গেলো। অথচ সরকার বারবার বলছে তাদেরকাছে যে পরিমাণ পেঁয়াজ মজুত আছে তাতে অন্তত ৩ মাস চলা যাবে। তাহলে পেঁয়াজের দাম বাড়লো কেন?

সরকারের কথা যদি ঠিক হয় তাহলে তো অন্তত ২ মাস বা তার বেশি সময়ের আগে বাংলাদেশে পেঁয়াজের সংকট তৈরি হবার কথা না। তাহলে দাম বাড়লো কেন? কারা বাড়ালো এবং কেন বাড়ালো? আমরা হরহামেশাই ভারতকে গালমন্দ করি যে তাদেরকে বাংলাদেশের বন্ধু বলা হলেও তারা আসলে আমাদের শত্রু। তারা সব সময় আমাদের বিপদে ফেলে। ভারত আমাদের বন্ধু না শত্রু সে তর্কে আজকে না যেয়ে বরং তর্কের খাতিরে ধরে নিলামতারা আমাদের শত্রু সে কারনে তারা হঠাৎ করে পেঁয়াজের রফতানী বন্ধ করে দিয়ে আমাদের বিপদে ফেলতে চেয়েছে বা বিপদে ফেলে দিয়েছে।

কিন্তু ৩ মাসের মজুত থাকার পরও হঠাৎ করে দাম বাড়িয়ে দিয়ে আমরা কি করলাম? আমরা তো আমাদের শত্রু না তাহলে কেন করলাম এই কাজ? কেন এই বিপদের সময় দেশের সাধারণ মানুষের পাশে না দাঁড়িয়ে নিজের লোভ

বিবেচিত হয়।

আসলে আমাদের নিজেদেরক্ষতি করার জন্য কোন ভারত কিংবা অন্য কোন শক্তির প্রয়োজন হয় না আমরা নিজেরাই যথেষ্ঠ নিজেদের ক্ষতি করার জন্য। যতদিন আমাদের এই চরিত্র না বদলাবে ততদিন পর্যন্ত আমাদের দেশের কোন উন্নতি সম্ভব নয়।

লেখক : গণমাধ্যমকর্মী

হৃদয়ে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

বঙ্গবন্ধুর হত্যা মামলার অন্যতম সাক্ষী তৎকালীন ডাইরেক্টর জেনারেল অফ ইন্টেলিজেন্স এর ডিজিএফআই ঢাকার ডিটাসমেনট এর প্রধান এবং বৃহত্তর সুন্দরবন এলাকার বীর মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে খ্যাত মেজর জিয়াউদ্দিন আহমেদ আদালতে দেয়া সাক্ষ্যে ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ সালের সন্ধ্যায় তিনি বঙ্গভবনে যান সেখানে রাষ্ট্রপতি রুমে বিশ্বাসঘাতক খন্দকার মোশতাক তাহেরউদ্দিন ঠাকুর মেজর জেনারেল শফিউল্লাহ মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশারফ নৌবাহিনী প্রধান রিয়ার এডমিরাল এমএইচ খান বিমান বাহিনীর প্রধান এয়ার ভাইস মার্শাল এ কে খন্দকার সামরিক সচিব কর্নেল জামিল ঘাতকদের সদস্যমেজর ডালিম মেজর শাহরিয়ার রশিদ মেজর ফারুক মেজর নূর মেজর মহিউদ্দিন মেজর আজিজ পাশা আলোচনারত ছিলেন।

আওয়ামী লীগ সরকারের মধ্যে ঘাপটি মেরে থাকা খুনি মোশতাক তাহের ঠাকুর মাহবুব আলমসহ অনেকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সেদিন বঙ্গবন্ধু হত্যার সাথে জড়িত ছিল। দেশবাসী যা চাই সব ক্ষেত্রে তার প্রাপ্তি ঘটে না নইলে আব্রাহাম লিংকন ঘাতকদের হাতে প্রাণ দিবেন কেন? তার এমন মৃত্যু কি কেউ কামনা করেছিল? কেউ কি কামনা করেছিল গান্ধীজীর উন্মুক্ত বক্ষে বুলেটের আঘাত হবে ? মার্টিন লুথার কিং প্রাণহীন দেহ এমনি করে মাটিতে লুটিয়ে পড়বে ঘাতকের অস্ত্রাঘাতে । চে গুয়েভারকে নির্মমভাবে গুলি করে হত্যা। নেলসন ম্যান্ডেলাকে ফাঁসির মঞ্চথেকে ২৭ বছর কারাবরণ ।

সারা বিশ্বের কাছে স্বীকৃতি চাইলেন দেশ গঠনে সহযোগিতার জন্য বিশ্ববাসীর কাছে উদাত্ত আহবান জানালেন। অসাম্প্রদায়িক চেতনায় দেশ গড়ার লক্ষ্যে বাঙালি জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র,সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা জাতীয় চার মূলনীতি সংবিধানে সন্নিবেশিত করে ১৯৭২ সালের সংবিধান দিলেন যা ছিল একটি রেকর্ড এবং অবিশ্বাস্য । এত স্বল্প সময়ে পরিপূর্ণ একটি সংবিধান তৈরি করা সত্যিই দুঃসাধ্য ছিল তবুও তিনি সেটি করে দেখিয়েছেন এই সেই বঙ্গবন্ধু। সদ্যস্বাধীন দেশের সাধারণ মানুষের ম্যান্ডেট গ্রহণের জন্য ১৯৭৩ সালের সাধারণ নির্বাচন দিয়েস্বাধীন বাংলাদেশের নবযাত্রা শুরু করলেন ।

কখনও রাষ্ট্রপতি কখনও প্রধানমন্ত্রী কখনও রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু একটি সোনার বাংলাদেশ গড়তে চেয়েছিলেন একাধিক বার রাষ্ট্রক্ষমতা পরিবর্তন করে স্থায়ী পূর্ণ সমাধানে আসতে চেয়েছিলেন। কোনদিন তিনি সরকারি বাসভবনে ছিলেননা । বাঙালির অকৃত্রিম ভালবাসা আর বিশ্বাস নিয়েস্বাধীনতা আন্দোলনের সূতিকাগার বাঙালির ঠিকানা ধানমন্ডির ৩২ নং এর নিজ বাড়িতেই থাকতেন। এই মানুষটার ছিল আল্লাহর উপর অগাধ বিশ্বাস এবং ভরসা। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে তিনি ঐতিহাসিক ৭মার্চ ভাষণে বলেছিলেন“রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরো দেবো। এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ”।

সেদিন যখন বাসা থেকে বেরিয়ে গাড়ীতে উঠছিলেন তখন তাঁর জীবনের সাথী প্রিয় ড্রাইভারটি বলেছিল আপনি জনসভায় যাচ্ছেন হাতে কাগজ পত্র কই? তখন বঙ্গবন্ধু উপরের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন কি বলবো আল্লাহ জানে। আল্লাহ আমাকে দিয়ে যা বলাবে আমি তাই বলবো। একথায় বোঝা যায় আল্লাহর প্রতি কি অগাধ বিশ্বাস ও ভরসা। বঙ্গবন্ধু জীবনে সব সেক্টরেই পদচারণা করেছেন। অনেক নেতাকে বলেছেন তোমরা শিশু হয়ে যাও। এত বিশাল হৃদয়ের মানুষটি ছিলেন শিশুর মত। তিনি শিশুর মত করেই হাসতেন।

প্রিয় অভিভাবক, একটু ভাববেন

কি?

রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম। একজন বয়স্ক লোককে বলতে শুনলাম, ‘সেই দিন কি আর আছে? দুনিয়া বদলে গেছে।’ বললাম, ‘চাচা, সেই দিন দিনই আছে। সেই দুনিয়া দুনিয়াই আছে। শুধু মানুষগুলো বদলে গেছে।’

মুরব্বি চাচা কথাটা বড় আক্ষেপ করেই বললেন। চারিদিকে যেভাবে শুরু হয়েছে কিশোর কিশোরীদের চলা ফেরা তাতে এমন কথা বলা স্বাভাবিক হয়ে পড়েছে। দিন দিন আমাদের কিশোর কিশোরীদের মধ্যে যেভাবে অপসংস্কৃতি ঢুকে যাচ্ছে তাতে ওদের নিয়ে দু’কথা না বলেও উপায় নেই। সংস্কৃতির চর্চা করতে গিয়ে অপসংস্কৃতি ঢুকে পড়ছে। দেখে দেখে শিখবে শিখুক। ভালো কাজ হলে আপত্তি নেই। কিন্তু মন্দটা নিয়ে কথাতো বলতেই হয়।

আমরা সকলেই সৌন্দর্য পছন্দ করি। তাই বলে এমন সৌন্দর্য চাই না, যে সৌন্দর্য আমাকে, আপনাকে বিপথে নিয়ে যাবে। সৌন্দর্য আবার বিপথে নিয়ে যায় কি করে? হ্যাঁ সে কথায় আসছি।

একজন মানুষের স্বভাব, মন-মানসিকতা কেমন হবে তা তার পরিবার, সমাজ, পরিবেশ, পোশাক-পরিচ্ছদ, বাবা-মায়ের শাসন-বারণ অনেকটা এগুলোর উপর নির্ভর করে। আপনার সন্তানকে আপনি যেভাবে গড়ে তুলবেন সে সেভাবেই গড়ে উঠবে। শিশুরাতো নরম তুলতুলে উপকরণ, যে ছাচে ফেলবেন সেটাই তৈরি হবে।

আমরা ছোটবেলায় সন্ধ্যার পর রাস্তায় বের হলে পাড়াতো চাচা, ভাইয়েরা বলতো, ‘ খোকা, সন্ধ্যার সময় বাইরে থাকতে নেই? বাড়ি যাও, পড় গিয়ে।’ তখন আর উপায় থাকতো না। তাদের সাথে তর্কবিতর্ক করার কোনো সুযোগ ছিল না। কারণ আমাদের শাসন করার অধিকার তাদেরকে দেওয়া হত। কিন্ত বর্তমান সময়ে সেই অধিকার খর্ব হয়েছে।

এখন ছেলেমেয়েরা বড়দের সাথে তর্কবিতর্ক করে। জোর করে কিছু বললে বরং অভিভাবকেরাই বলে, ‘আমার ছেলেমেয়েকে শাসন করার তুমি কে হে।’ আমি বলি কি, আমাদের অনেক কিছুই। আপনার অবাধ্য সন্তানের জন্য আমারটা যে নষ্ট হতে চলেছে।

ছেলে-মেয়েদের এই বেখেয়ালিপনা, বখাটে হয়ে যাওয়ার পিছনে সবচেয়ে বেশি দায়ী অভিভাবকেরা।

রাতের বেলা চায়ের দোকনে সিনেমা দেখতে আসবে পথ দেখার জন্য ছেলেকে টর্চ লাইট কিনে দিতে দেখেছি আমি। এইতো সেদিনের কথা, সেলুনে গিয়ে দেখি আমার এক পরিচিতজন তার ছেলের মাথার চুলের কাটিং দিয়েছে বাটি কাট। আমি বললাম, ‘ছেলের চুল এভাবে কাটালে কেন?’ প্রতিউত্তরে বলল, ‘আশেপাশে এখন এই চলছে।’ আমি বললাম, ‘আশেপাশে কিন্তু এখন এমনও চলছে, বাবা মাকে বৃদ্ধাশ্রমে রেখে আসা, গায়ে হাত পর্যন্ত উঠানো। এসবগুলোর জন্যেও প্রস্তুত হও। তুমিই ওকে সব চলাচলি শেখাচ্ছো।’

আমাকে দিয়েই বলি। যখন সিনেমা দেখতাম তখন কল্পনায় নিজেকে সিনেমার নায়ক মনে করতাম। দেখা গেল সিনেমা চলাকালীন নায়কের মারপিট দেখে আমিও পাশের জনকে হঠাৎ দুম করে বসিয়ে দিয়েছি। অথবা সামনের চেয়ারে বসিয়ে দিয়েছি দুমা দুম দু ঘুষি। নায়কের হাত-কপাল কেটে, ফেটে গেলে নায়িকা শাড়ির আঁচল ছিঁড়ে বেঁধে দিতেন।

কিন্তু আমি গো বেচারা প্রতিক্রিয়া পেতাম বকুনি আর হাতের অসহ্য ব্যথা। এরপরও ক্ষান্ত হইনি। নায়কের মত হতেই হবে। এ জন্য দেখাদেখি চুল ছেটেছি, প্যান্ট কিনেছি ছেঁড়া ফাঁটা। এখন আমার মেজাজ মর্জি দেখে কে। আমিও নায়ক। হায় হায়, বাড়িতে এসে দেখি ভাত নাই। বুঝলেন না? যদি বলি হাড়িতে ভাত নেই, সেটাও ঠিক আবার যদি বলি সমাজে আমার কোনো মূল্য নেই সেটাও মন্দ বলা হবে না। কল্পনার নায়কের বাস্তবের এই হাল।

এমন ঘটনাও রহরহ ঘটছে, ভারতের নাটক সিনেমার সিরিয়াল দেখে ওসব চরিত্র নিজের মধ্যে কল্পনায় এঁকে নিজেকে ওমন পোশাকে সাজাতে বাধ্য করেছে পোশাক কিনে দিতে। হয় পোশাক দাও, না হয় বিষ দাও। এজন্যই বলছি, ছেলে-মেয়েরা যে পরিবেশের সাথে পরিচিত হবে সে নিজেকে সেভাবেই প্রস্তুত করতে চাইবে।

এসব ছেলেরাই আজকের গ্যাং কালচার গড়ে তুলছে। টিকটকের অমক ভাই তমক ভাই হয়ে উঠছে। এরা আজ উন্মুক্ত। ইচ্ছে মত চুলের কাটিং দেয়, রঙ করে, বাইক নিয়ে রোড শো করে। অপসংস্কৃতির চর্চা করে। ঘুরে বেড়ায়। নেশা করে।

আপনি হয়ত ভাবছেন, পরের ছেলে, আমার কী। আপনার অনেক কিছুই। আজ অথবা কাল আপনার সন্তান ওদের দেখানো পথেই হাটবে। শুধু সময়ের অপেক্ষা। তাই আজই সতর্ক হোন।

আপনার সন্তানের হাতে এড্রয়েড ফোন তুলে দিচ্ছেন? সে সারাদিন গেমস খেলে সময় পার করছে। লাখ টাকার বাইক কিনে দিচ্ছেন? রাস্তায় নায়কের

মত হেলতে দুলতে চলতে চলতে দুর্ঘটনা ঘটাচ্ছে।

অনেক অভিভাবককে বলতে শুনেছি, ‘কি করবো বলো, ওদের সাথে পারা যায় না।’ যখন ওদের সাথে পারা যেত ঠিক তখনি আপনি ইচ্ছে করেই ওদের কাছে হেরে গেছেন। তাই এখন আপনি হারতে বাধ্য হচ্ছে।

একটা কবিতার কথা মনে পড়ে গেলে।

‘ ‘আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে
কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে?’’

আমরা সকলেই এই কবিতাটা পড়েছি আর না হয় কারো কাছ থেকে শুনেছি নিশ্চয়। কুসুমকুমারী দাসের বিখ্যাত কবিতা ‘আদর্শ ছেলে’ কবিতার প্রথম দু লাইন এগুলো। কবি বড় আক্ষেপ নিয়ে লিখেছিলেন এই কবিতা। সত্যিই আজ আদর্শ ছেলের বড়ই অভাব। কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবার ছেলে আজ নিতান্তই হাতে গোনা। আমরাও অপেক্ষায় আছি সেই ছেলের, যে ছেলে সিনেমার নায়ক না হয়ে সত্যিকারের নায়ক হবে; সৎ, নীতিবান ও দেশ প্রেমিক হবে।

চাইনে এমন অপসংস্কৃতি। আমরা বাঙালি। ওমন মর্ডান ছেলের চাইতে ঢের ভালো চাষার ছেলে। বাবার দেওয়া লাখ টাকার বাইকে চেপে রোড শো করা ছেলের চাই হাতে মোহন বাঁশি তুলে নেওয়া গরু মহিষের রাখাল ছেলে অতি উত্তম। যে কিনা মাঠ থেকে ফিরেই বাবা-মাকে জিজ্ঞেস করবে খাবার খেয়েছে কিনা। চাঁদনি রাতে উঠানে বসে তুলবে ঝুমুর গানের সুর।

লেখক: মুহাম্মদ বরকত আলী (শিশুসাহিত্যিক ও গল্পকার)

ভাস্কো-দা-গামা থেকে মুজিবনগর —মাসুম উল হক মিন্টু

১৪৯৮ সালে পর্তুগিজ নাবিক ভাস্কো-দা-গামা ভারতবর্ষে আসার সমুদ্রপথ আবিস্কার করার পর ফরাশি ও ইউরোপীয় বণিকদের এই উপমহাদেশে আগমনের আগ্রহ জাগে ১৫৯৯ সালে ২১৮ জন সদস্য নিয়ে লন্ডনে

“দুঃসাহসী বনিক গোষ্ঠী নামে বণিক সংঘ গঠন হয়। ১৬০০ সালের ১লা ডিসেম্বর ” ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ” নামে মহারানী সনদ লাভ করে এবং রানী স্বয়ং কোম্পানির অংশীদার হন। ১৬১৩ সালে মোঘল সম্রাট জাহাঙ্গীর এক ফরমানের মাধ্যমে সূরাটে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে বানিজ্য কুঠি স্থাপনের অনুমতি দেন।

বিভিন্ন কারনে সম্পর্কের অবনতি হতে থাকে যার ফলে ১৬৮৬ সালে হুগলি,বালেশ্বর,হিজলি মোঘল দুর্গ আক্রমন ১৬৮৭সালে চট্রগাম আক্রমন করে পরাজিত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা এবং ১৬৯০ সালে মোঘল ও ইস্ট ইন্ডিয়ার সন্ধিচুক্তি সম্পাদিত হয়। ১৬৯৮সালে কোম্পানি কলকাকায় ফোর্ট উলিয়াম দুর্গ স্থাপন করে।

১৭৫৬ সালের ১০ এপ্রিল সিরাজ -উদ-দৌলা বাংলা, বিহার, উড়িস্যার নবাব হিসাবে সিংহাসনে বসেন। মুলতো বিনাশুল্কে বানিজ্য কে কেন্দ্র করে নতুন নবাব ১৭৫৬ সালের ৪ জুন কাসিমবাজার কুঠি আক্রমন এবং ২০ জুন কলকাতা দখল করেন। শুরু হয় প্রাসাদ ষঢ়যন্ত্র ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশী যুদ্ধের পরাজয়ের পর ২৯ জুন ১৭৫৭ তে মীর জাফর পুত্র মিরনের নির্দেশে মোহাম্মদী বেগ নবাব সিরাজ কে নৃশংসভাবে হত্যা করে। শুরু হল পুতুল নবাবদের হাত ধরে ব্রিটিশ শাসন যা চলমান ছিল ১৯৪৭ পযন্ত।

মুলতো ১৭৬৪ সালে বক্সার যুদ্ধের মধ্যে ব্রিটিশ শাসনের সিমানা বৃদ্ধি পেতে থাকে, কিছুদিন না যেতেই বিভিন্ন সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে ব্রিটিস হটাও আন্দোলন জোরদার হতে থাকে। শতাধিক বছর পথ পরিক্রমার পর ১৮৮৫ সালের ২৮ ডিসেম্বর বোম্বে (মুম্বাই) এ বসে প্রতিষ্ঠা হয় “”ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস””।

১৯০৬ সালে সালে ঢাকায় বসে গঠিত হয় “” মুসলিম লীগ”। অল্পকথায় বলি মুলতো মুসলিম লীগ ও ভারতীয় জাতীয় কংগেসের রাজনৈতিক আন্দোলনের ফসল ১৯৪৭ সালের ভারত, পাকিস্থান স্বাধীনতা। জিন্নাহর দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে যথাক্রমে ১৯৪৭ সালের ১৪ ও ১৫ আগস্ট জন্মলাভ করলো জিন্নার নেতৃত্বে পাকিস্থান ও নেহেরুর নেতৃত্বে ভারত।

আমরা হতভাগ্য জাতি হলাম পূর্ব পাকিস্থানেরর বাসিন্দা । শুরু হল নতুন খেলা রাষ্ট্রের শাসনভার পশ্চিমাদের হাতে থাকায় শাসনের নামে শোসন, যে কোন সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি…!

১৯৫২ সালের সালের ভাষা আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে স্বাধীনতার বীজ বপন এবং১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে তা অর্জন ছিল আমাদের

পরাধীনতা থেকে মুক্তি।

১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭০ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বে নির্বাচনে জয়লাভের পর গদিতে বসতে না দেওয়ায় ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে ঐতিহাসিক ভাষনের মধ্যে দিয়ে ববঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষনা ছিল বাঙ্গালি জাতির পরাধীনতা থেকে মুক্তির স্বপ্ন।

২৬ মার্চ ১৯৭১ বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষনা পত্র পাঠের মধ্যে দিয়ে দিয়ে স্বাধীনতার পথে বাংলাদেশ । এবার সরকার গঠনের পালা
১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুর সাবডিবিশনে সিমান্তবতি গ্রাম বৈদ্যনাথ তলায় বাংলাদেশর স্বাধীনতার ঘোষনার আদেশ জারি করা হয় এবং ১৭ এপ্রিল এই প্রবাসি সরকার সফত গ্রহন করেন যা মুজিবনগর সরকার নামে ইতিহাসের পাতায় জায়গা করে নেয়। দীর্ঘ নয়মাস মহান মুক্তিযুদ্ধেরর মধ্যে দিয়ে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পৃথিবীর মানচিত্রে জায়গা করে নেয় প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ। মেহেরপুরের মুজিবনগর হয়ে ওঠে ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। স্বাধীনতার সূতিকাগার ও মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের রাজনৈতিকদের তৃর্থস্থান মুজিবনগর বর্তমানে বাংলাদেশেরর অন্যতম দর্শনীয় স্থান।

লেখক: কলেজ শিক্ষক ও সাবেক প্রিন্সিপাল (ইন চার্জ), টি জে ডিগ্রী কলেজ, গাংনী, মেহেরপুর।

করোনা ও তারুণ্যের অর্থনীতি ভাবনা

দৃশ্য-০১: বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে লাখ লাখ শিক্ষার্থী পড়াশুনা করছে। তাদের একটা অংশ প্রতিবছরের শেষে কিংবা শুরুতে পড়াশুনার পাঠ চুকিয়ে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রবেশ করে। যদিও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকার জন্যে দীর্ঘায়িত হচ্ছে সে প্রক্রিয়া। করোনা পরিস্থিতি ভাল হলেই তাৎক্ষণিকভাবেই তারা একাডেমিক যোগ্যতা অর্জন

করে ফেলবে।

দৃশ্য-০২: আমাদের দেশীয় আয়ের বড় একটা অংশ আসে রেমিট্যান্স থেকে। যার সিংহভাগই মিডেল ইস্টে। কিন্তু মিডেল ইস্টের অধিকাংশ দেশই তেলের উপর নির্ভরশীল। বর্তমানে বিশ্ববাজারে তেলের দাম আশংকাজনক হারে কমে যাওয়ায় মন্দার কবলে পরতে যাচ্ছে সে সব দেশ। যা দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার একটা বড় সম্ভবনা রয়েছে। তার ফলাফল ইতোমধ্যেই আমরা দেখতে পারছি। অনেক দেশ থেকেই কর্মীরা ফেরত আসছে, এবং তাদের আবার কর্মস্থলে ফিরে যাবার সম্ভাবনা বা সুযোগ কম।

দৃশ্য-০৩: আইএলও বলছে বিশ্বজুড়ে প্রায় ৪০ ভাগ চাকরি কমেছে। কমবে আরো বেশি।

দৃশ্য-০৪: বর্তমানে দেশে সরকারি চাকরিজীবীরা বাদে বাকিদের অবস্থা ক্রমাগত খারাপ হচ্ছে। বেতন কমছে,কিংবা বকেয়া জমছে কিংবা ছাটাই হচ্ছে বা হওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে দিন কাটাচ্ছে।

প্রথম দৃশ্য মতে দেশে অনেক তরুন অর্থনীতিতে প্রবেশ করতে চেষ্টা করবে। দ্বিতীয় দৃশ্য মতে, দেশে ফেরত আসা অনেক মানুষ বেকার হয়ে চাকরির বা ব্যবসার সন্ধান করবে। তৃতীয় দৃশ্য মতে দেশে চাকরী কমে যাবে। প্রথম তিনটা দৃশ্য যদি আমরা এক সুতায় আনতে চাই, আমরা দেখবো দেশে খুব সহসাই ‘বর্তমান কর্মক্ষম’ মানুষের সংখ্যা অনেক বেড়ে যাবে কিন্তু সহসাই চাকরি বাড়বে না। তাই অনেক বড় একটা অংশ ব্যবসা করতে আগ্রহী হবে।

ব্যবসায় আগ্রহী হওয়া বড় সংখ্যার মানুষের মূলধন এবং দক্ষতার ঘাটতি দেখা দিবে। আমরা যদি মূলধন নিয়েই কথা বলি, এই করোনায় পারিবারিক আয় ও সঞ্চয় কমছে। তাই আশংকা করা যায়, ব্যবসার জন্য তাদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক ভাবেই মূলধন সংগ্রহ করা সম্ভব হবে না। এক্ষেত্রে ব্যাংক বড় একটা ভূমিকা পালন করতে পারে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে অনেক বছর ধরেই আমাদের ব্যাংক সেক্টরের অবস্থা ভাল নেই। প্রতিনিয়ত বাড়ছে খেলাপী ঋণের পরিমাণ, অর্থ পাচার তো আছেই। এর পাশাপাশি সরকার বড় একটা পরিমাণ ব্যাংক ঋণ নিয়ে থাকে। ব্যাংক যদি লোনে সুদের হার বাড়ায় সেক্ষেত্রে নতুন বা ছোট পরিসরে থাকা ব্যবসায়ীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কারণ বর্তমানে মানুষের ক্রয়ক্ষমতাও হ্রাস পাচ্ছে। ব্যবসায় রাতারাতি লাভ করাও কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। এছাড়া বড় একটা সংখ্যা ব্যবসা শুরু করতে না পেরে বা চাকরি না পেয়ে বা দক্ষতা অর্জন করতে না পেরে যদি অপরাধের সাথে যুক্ত হয়ে যায়

তাহলে সমাজে ক্রাইমের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। অতীত মহামারীর পরে সমাজে বিশৃঙ্খলা বাড়ার ইতিহাস রয়েছে।

আর সমাজে যদি বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধি পায়, তাহলে ব্যবসা অনুকূলতা না পেয়ে অনেকেই ব্যবসায় আগ্রহ হারাবে, বাড়বে না বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান। বাজারকে বিশ্বাস করতে না পারলে বিনিয়োগ কমে যায়।

এর মাঝেই দৃশ্যমান হবে চতুর্থ দৃশ্য! বড় একটা অংশ তখন কষ্ট করে হলেও সরকারি চাকরির পেছনে ছুটবে। ৩০ বছর পর্যন্ত চেষ্টা করতে থাকবে, কিন্তু অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত হবে না, এটাও দেশের জন্যে একটা অর্থনৈতিক ক্ষতি।

সম্ভাব্য ফলাফল গুলো ভয়াবহ। আমাদের এখনি সচেতন হতে হবে। গড়ে তুলতে হবে দক্ষ জনশক্তি, বাজারকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে হবে যাতে বিনিয়োগ বাড়ে। তরুণদের হাতেই গড়ে উঠতে পারে আগামীর সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ। আবার হতে পারে উল্টোটাও! ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে এখনি আমরা কি সিদ্ধান্ত নিচ্ছি তার উপর।

লেখক: ডেভলপমেন্ট এক্টিভিস্ট, ই-মেইল:rafiuahamed1971@gmail.com

ভয় – এসআই মেহেদী

ভয়ে আজ থরথরিয়ে হাতটি কাঁপছে! কী বোর্ডে হাত ঠিকমতো পড়ছে না। মাথাটাও কেমন যেন দপ দপ করছে। হাত পা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে। খুব খুব বেশি ভয় হচ্ছে! অজানা আতঙ্কে হৃদয়ের কম্পন গতি বেড়েই চলেছে। একটি পরাজয়ের ভয় যেন সবকিছুকে ছাপিয়ে উঠেছে আমার মানসপটে। কেন এতো ভয় হচ্ছে আমার?

৭১ এর রনাঙ্গনে গুলিবিদ্ধ কিশোর ছেলেটিতো সেদিন ভয়ে কাঁদেনি! জীবনের শেষগুলিটিও তো তার লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়নি? তের বছরের কিশোরী মেয়েটি সেইদিন দশজন পাকিস্তানী নরপশুর কাছে নিজেকে সঁপে দিতে এতটুকু ভয় পায়নি? সেই একই দিনে, রাজারবাগ বেতারের কনস্টেবল তো আক্রমণের খবর ছড়িয়ে দিতে ভয় পায়নি! এমনকি আমার পূর্ব পুরুষরা সাজোয়া ট্যাংকের উপর গুলি ছুড়তেও একাত্তরে ভয় পায়নি। তাহলে আজ

আমি কেন এতো ভয় পাচ্ছি? আমি তো তাদেরই উত্তরসূরী। তাহলে কি আমি ভীতু! সত্যিই কি আমি ভীতু?

আমিও তো চালিয়েছি সিন্দাবাদের সেই পঙ্খীরাজ। দুর্দান্ত দাপটের সাথে টিপু সুলতানের মতো, আস্তাবলের সবচেয়ে তেজি ঘোড়াটা নিয়ে ছুটেছি সারদার পুলিশ ট্রেনিঙয়ের মাঠে। এক লাফে চুড়ায় উঠেছি; নয় ফুট উচ্চতার সমান সীমানা প্রাচীরের। রশি বেয়ে উঠেছি বাইশ ফুট। গ্রীষ্মের কাটফাটা দাবদাহের গরমে পুড়ে কংক্রিটের রাস্তা ধরে প্রতিদিন দৌড়েছি দশ কিলোমিটার পথ।

একআঙ্গুলে বহন করে চলেছি চার কেজি ওজনের হাতিয়ার। আমার আঙ্গুলের ইশারায় গগনবিদারী শব্দে গর্জে উঠেছে বিশ্বসেরা সব আগ্নেয়াস্ত্র। কিন্তু আমি তখন একটুও ভয় পাইনি।প্যারেড গ্রাউন্ডের পাশে দেখেছি নতুন নতুন কবর! যারা কয়দিন আগে আমাদের মতো করে দৌড়াতো এই কংক্রিটের রাস্তা ধরে। দেখেছি সারদাহ এর মাঠে হঠাৎ পাশের বন্ধুটি কংক্রিটের উপর পড়ে ডুকরে ডুকরে কাঁদতে।

আর আমরা তাকে ফেলে দৌড়ে চলেছি। ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে কতো জন ভেঙ্গেছে হাত, পা এবং কোমর। তাদেরকে নিয়ে দ্রুত গতিতে মাঠ ছেড়েছে অ্যাম্বুলেন্স। তখনতো কোন ভয় পায়নি আমি। মৃত্যু পুরীতে কাটিয়েছি একটি বছর। প্রতিদিন আশে পাশে ঘুরেছে আজরাইল।

একটুও ভয় পাইনি। কিন্তু আজ আমার বড্ড ভয় হচ্ছে। এক বছরের মৌলিক প্রশিক্ষন শেষে পবিত্র সংবিধান, পতাকা ও পবিত্র কোরআনে উপর হাত রেখে শপথ করছি দেশ মাতৃকার প্রয়োজনে নিজের সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করতে দ্বিধাবোধ করবো না। তাহলে কেন? কেন সেই আমি আজ ভয় পাবো?

আমার ভয় হচ্ছে। বড্ড ভয় হচ্ছে। ভয় হচ্ছে, হাজারো আশরাফুল শেখদের কথা ভেবে। নড়াইলের আশরাফুল শেখ। বয়স আর কতোই বা হবে!দুই কন্যা সন্তানের জনক তিনি। বড় মেয়েটি এবার অনার্স শেষ করেছে; আর ছোট মেয়েটি এবার এইচ এস সি দিবে।

আশরাফুল শেখ রোগাক্রান্ত জীর্ণ শীর্ণ শরীরে মাদুরের বোঝা মাথায় নিয়ে পায়ে হেঁটে গ্রামে গ্রামে ফেরি করে। তার পা যেদিন চলে না; বাড়ির চুলাটাও সেইদিন জ্বলেনা। আশরাফুল শেখের শরীরটা বেশ কয়েক বছর ধরেই খারাপ। চিকিৎসা তো দূরের কথা, মৃত্যুর আগ পযর্ন্ত একবেলা বিশ্রাম তার কপালে জোটেনি। তার কোন পুত্র সন্তান না থাকায় পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি তিনি। একটি মাত্র

কুড়ে ঘর ছাড়া আর কোন সম্পদ তার নাই। মেয়ে দুইটি পড়াশুনায় খুব ভালো।

আশরাফুল শেখ ক্ষুধা পেটে অসুস্থ শরীরে মাদুরের বোঝাটি মাথায় নিয়ে মনের জোরে ধীরপায়ে এ গ্রাম থেকে সে গ্রামে ঘুরে ঘুরে ফেরি করে। ভাবে বড় মেয়েটা চাকরী পেলে তার আর কস্ট থাকবে না। আশরাফ শেখ শেষ কবে দুপুরের খাবার খেয়েছে তার মনে পড়ে না। কখনো একটা বিস্কুট সাথে কয়েক গ্লাস পানি দিয়ে পেটটা ভরেছে।তবে ইদানীং সে মনে করে তার চিকিৎসা করানোটা খুব বেশী দরকার।

কিন্তু ভাত যেখানে স্বপ্ন; চিকিৎসা সেখানে বিলাসিতা ছাড়া আর কি! ছোট মেয়েটার সামনে পরীক্ষা। তার একটা জামা কেনার দরকার। আশরাফ শেখ প্রতিদিন অল্প অল্প করে জমিয়ে তিনশ টাকার মতো করতে পেরেছে। বড় মেয়েটার এমবিএ ভর্তীর তারিখ দিয়েছে। লাগবে তিনহাজার টাকা। এই সব ভাবতে ভাবতে আশরাফ শেখ জ্ঞান হারিয়ে ফেলে।

কোন ভাবেই আশরাফ শেখের জ্ঞান ফেরেনা। স্থানীয়দের সহায়তায় তাকে নড়াইল সদর হাসপাতালে নেওয়া হলে ডাক্তার উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় প্রেরণ করেন।

আশরাফ শেখের মেয়েরা স্থানীয়দের কিছু সহায়তা এবং সুদি মহাজনের কাছ থেকে ধার করে চব্বিশ হাজার টাকা নিয়ে গত ১১/৫/২০২০ তারিখে ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশনে হাসপাতালে ভর্তি করায়। টাকার অভাবে তেমন কোন চিকিৎসা সে পায়নি।

এরই মধ্যে আশরাফ শেখের শরীরে করোনা ভাইরাসের লক্ষ্মণ প্রকাশ পায়। পরীক্ষায় আশরাফ শেখের করোনা পজিটিভ আসে। অভিমানী আশরাফ শেখ ২০ মে ২০২০ তারিখে পৃথিবীর মায়া ছেড়ে আল্লাহ্র কাছে আপন গন্তব্যে পাড়ি জমান।

কিন্তু আশরাফ শেখ মরেও যেন মুক্তি পেলোনা। পেলোনা প্রিয় ভূমি ও প্রিয় মানুষের বিদায়। যেহেতু আশরাফ শেখ করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত ছিলো, তাই তাকে কবর দেওয়ার জন্য কেউ জমি দেয়নি। কেউ খুড়তে চাইনি তার কবর। আশরাফ শেখের অসহায় মেয়ে আর স্ত্রীর বুকফাটা কান্নায় গলেনি কারোর হৃদয়।

এদিকে হাসপাতাল থেকে লাশ নেওয়ায় জন্য বার বার তাগাদা দিচ্ছে কতৃপক্ষ। কি করবে আশরাফ শেখের মেয়ে আর স্ত্রী? তাদের তো নিজের কোন জমি নাই। আবার লাশ দাফনের মতো কোন পুরুষ মানুষ ও নাই।

তারা অঝোর ধারায় কেঁদেই চলেছে হাসপাতালের সামনে।

আল্লাহ মানুষকে কেন এতো কঠিন পরীক্ষায় নেন? মানুষ কেন এতো বেশী অসহায়? হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের জোরাজুরীতে আশরাফ শেখের মেয়ে তাদের অসহায়ত্বের কথা কর্তৃপক্ষকে জানালে তারা লাশ পুলিশ কে দিয়ে দেওয়ার পরামর্শ প্রদান করে।

আশরাফ শেখের মেয়ে একথা শুনে স্তব্ধ হয়ে যায়। তারা তার বাবাকে চিকিৎসা করাতে পারলো না; মরার পরে নিজেরা দাফন কাজও করতে পারবে না। তার প্রিয় বাবার লাশটাও বাড়িতে নিতে পারবে না।

আশরাফ শেখের মেয়ের বুক ফাটা চিৎকারে হাসপাতালের আশপাশে এলাকার বাতাস ভারি হয়ে উঠে। বারবার বাড়িতে ফোন করে কোন সাড়া না পেয়ে আশরাফ শেখের মেয়ে কান্না থামিয়ে বলে, আপনারা যেটা ভালো মনে করেন সেটাই করেন।

আমরা লাশ গ্রামে নিতে পারবো না। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের অনুরোধে অফিসার ইনচার্জ মিরপুর মডেল থানা লাশ দাফনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এইসব দেখে শুনে আর নিজেকে ঠিক রাখতে পারছি না। ইদানীং খুব তাই ভয় হচ্ছে আমার!

সরকারি দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে বিশজনের করোনা পজিটিভ মিরপুর থানায়। করোনা উপসর্গ নিয়ে পরীক্ষার অপেক্ষায় আরো দশজন। তাই ভয় হয় মিরপুর থানার আমরা সবাই যখন করোনা পজিটিভ হয়ে যাবো তখন কি ঘটবে? আশরাফ শেখদের লাশ কি তখন রাস্তায় পড়ে থাকবে?

এজন্যই কি তের বছরের কিশোরীটা সেদিন তার শরীরের উপর পাকিস্তানী সেনাবাহিনীদের উদ্দাম নাচ নাচতে দিয়েছিল? সে কি জানতো টাকার অভাবে আশরাফ শেখদের চিকিৎসা হবে না? জমি না থাকার কারনে নিজ গ্রামে তার কবর হবে না?

আশরাফ শেখদের কথা শুনে কি কষ্ট পাবেনা সেদিনের সেই কিশোর যোদ্ধাটি। সে যদি জানতো আশরাফ শেখদের জন্য স্বাধীন দেশে এই পরিনতি অপেক্ষা করছে তাহলে কি সে ভয় পেতো না?

সে কি পারতো গুলি করে লক্ষ্য ভেদ করতে? নিশ্চয়ই এ কথা জানলে তার হাত কাপতো! বুক চিতিয়ে দাড়াতে পারতো না সেদিন রাজার বাগের পুলিশ বাহিনী!

তাই আজ আমার বুক ভয়ে দূরু দূরু করছে! আমার তো টাকা নাই; চিকিৎসা

হবেতো? আমার জমি নাই কবরের জন্য; কেউ জমি দিবে তো? আমার থানায় বিশজন আক্রান্ত!

আমি যদি করোনা আক্রান্ত হয়ে মারা যায় আমার লাশ নিজ গ্রামে নেওয়া হবেতো? তাই একথা বলতে আজ আমার কোন লজ্জা নাই! ভয়ে আমার বুকটা কাঁপছে।

সত্যিই খুব ভয় পাচ্ছি আমি।

মেপ্র/এমএফআর